হিন্দু পারিবারিক আইন সংস্কারের সুপারিশ বিষয়ক আইন কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন

ভূমিকা

হিন্দু পারিবারিক আইন বলতে বিবাহ, ভরণপোষণ ও বৈবাহিক সম্পর্ক হতে উদ্ভূত অন্যান্য বিষয়, উত্তরাধিকার, দান, উইল, দত্তক, নাবালকের তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনুসৃত ধর্মীয় আইন বুঝায়। এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে হিন্দু আইন আইনসভা কর্তৃক একাধিকবার পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। ঐ সকল রাষ্ট্রীয় আইনও এখন হিন্দু আইনের অংশ।

পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনে এবং বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের সার্বজনীন ধারণাকে সামনে রেখে অন্যান্য আইনের মত পারিবারিক আইনেরও সংস্কার করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইন কমিশনের ২০১০-২০১১ সনের দ্বি-বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় পারিবারিক আইনের পর্যালোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরই অংশ হিসেবে হিন্দু পারিবারিক আইনের গবেষণা কাজ আরম্ভ হয়।

এই গবেষণা প্রতিবেদনে হিন্দু পারিবারিক আইনের বর্তমান অবস্থা, সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, সংস্কারের গ্রহণযোগ্যতা, প্রতিবন্ধকতা ও সংস্কারের পক্ষের এবং বিপক্ষের ব্যক্তিগণের যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি হিন্দু অধ্যুষিত ভারতের আইনী সংস্কার পর্যালোচনা করা হয়েছে। আইন কমিশনের নিজস্ব এই গবেষণায় UNDP এর অর্থায়নে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পরিচালিত “Promoting Access to Justice and Human Rights in Bangladesh” প্রজেক্ট থেকে সহায়তা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আইন কমিশন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

গবেষণা পদ্ধতি

শুরুতেই বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে আইন কমিশনের একটি সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল হিন্দু আইনের সংস্কার বিষয়ে বেসরকারী সংস্থাগুলোর ইতোমধ্যে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল সংগ্রহ। উক্ত সভায় আইন ও সালিস কেন্দ্র, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ লিগ্যাল এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট, ব্রাক ও বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাদের মাঠ পর্যায়ের গবেষণার ফলাফল ও প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের খসড়া সরবরাহ করে এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করে।

এর পাশাপাশি প্রচলিত হিন্দু আইন, পার্শ্ববর্তী দেশের সংস্কার এবং হিন্দু আইন সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইনগুলো পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার লেখা সংগ্রহ করা এবং প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রশ্নমালা তৈরী ও বিতরণ করা হয়। ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর হিন্দু জনগোষ্ঠির ২৫০ জনের নিকট প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হয় যাদের মধ্যে বিচারক, আইনজীবী, ছাত্র, গৃহিণী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও অন্যান্য পেশাজীবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ২৪৬ জন উত্তরদাতা তাদের মতামত প্রেরণ করেন যা একত্রে সংকলন করা হয়।

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তিনটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনায় হিন্দু আইনের সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিনা বা সংস্কারে বাধা কোথায় বা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সংস্কার হতে পারে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত গ্রহণ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি আলোচনাপত্র তৈরী করে জাতীয় কর্মশালায় আলোচনার জন্য তুলে ধরা হয়। উক্ত কর্মশালায় সংস্কারের পক্ষ-বিপক্ষের প্রতিনিধি, নীতি নির্ধারক, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া South Asain Institute of Advanced Legal and Human Rights Studies (SAILS) কর্তৃক এ বিষয়ে আইন কমিশনের সহযোগিতায় কৃত গবেষণা কমিশনের কাজকে সহজতর করেছে। এভাবে গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতের ভিত্তিতে বর্তমান প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০০ সালে আইন কমিশন হিন্দু আইনের সম্ভাব্য সংস্কারের উপর একটি ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। তৈরী করা হয় একটি বিস্তৃত গবেষণাপত্র এবং তার ভিত্তিতে হিন্দু আইন সংস্কারের একটি খসড়া আইন। এগুলো রিপোর্ট আকারে কখনোই সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়নি। বর্তমান কমিশন তার রিপোর্ট প্রণয়নে উল্লিখিত গবেষণা ও খসড়া থেকে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেছে।

হিন্দু আইনের ভিত্তি

হিন্দু আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস হিসেবে বৈদিক যুগের ঐশী বাণীসমূহ (শ্রুতি বা বেদ) পরবর্তীতে বস্তুগত উৎস যেমন স্মৃতি, মন্তব্য, প্রথা, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ও লিখিত আইনে রূপ লাভ করেছে। তবে জীবন, সমাজ ও প্রকৃতির পরিবর্তনশীল বস্তুগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঋষী, মুনী ও পন্ডিতের লিখনীতে ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায়ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দু আইনের ক্রমবিকাশ

বৃটিশ ভারত আমল থেকে হিন্দু আইনের ক্রমবিকাশ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রথম দিকে হিন্দু আইনের তেমন কোন পরিবর্তন সাধন হয়নি। কারণ শাসকগণ তাদের রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে সর্বসাধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্য বিষয়ক আইন তৈরী করতেই আগ্রহী ছিল। পরবর্তীতে রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত মনিষীদের উদ্যোগে সতীদাহ এবং বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধকরণের মত প্রথা বিলুপ্ত করে কিছু যুগান্তকারী আইন প্রণীত হয়।

এই উপমহাদেশে ধর্মীয় এবং আইনের জটিলতার কারণে অনেকে হিন্দু আইনকে বিধিবদ্ধ আকারে প্রণীত করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে আসছিলেন। তবে যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগই এই বিরোধিতার অনুকূলে বেশী কাজ করেছে। পরবর্তীতে আইন পেশা ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টা ও কতিপয় বাস্তববাদী বিধায়কের বলিষ্ঠ সুপারিশক্রমে ১৯৪১ সালে হিন্দু আইনকে বিধিবদ্ধ করার

লক্ষ্যে হিন্দু আইনের বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা অনুসন্ধান পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য স্যার বেনেগাল নার্সিং রাও এর সভাপতিত্বে হিন্দু আইন কমিটি গঠন করা হয়।

এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন মতবাদের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হিন্দু আইনের প্রগতিশীল উপাদান ও একই বিষয়ে বিভিন্ন আদালতের পরস্পর বিরোধী রায়সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে হিন্দু আইনের একটি অভিন্ন কোডের খসড়া তৈরী করে বিল আকারে উপস্থাপন করা। সে মতে রাও কমিটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেন ও একটি ইউনিফর্ম Hindu Law Bill বা সংহিতা উপস্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর যারা ভারত সরকারের দায়িত্বে ছিলেন তারা রাও কমিটির খসড়া বিলটিকে খন্ড খন্ড আকারে পার্লামেন্টে উপস্থাপন করে চারটি আইন পাশ করেন যে বিষয়ে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের কারণে ঐ সকল আইন বাংলাদেশে প্রযোজ্য হয়নি। ভারতে হিন্দু আইনের আমূল সংস্কার হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইনে সংস্কারের ছোঁয়া লাগেনি। এর পিছনে ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গির বাইরে আরও কিছু রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও মনস্তাাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। এ বিষয়ে হিন্দু আইনের সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বৃটিশ ভারতের পর বাংলাদেশে হিন্দু আইনের ক্রমবিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

বৃটিশ আমলে যেসব রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা হিন্দু আইনের বেশ কিছু প্রচলিত প্রথার সংস্কার করা হয়েছিল তার মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশে বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য কিছু আইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

১। The Hindu Widow's Re-marriage Act, 1856 এই আইনের মুখবন্ধে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাকে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত প্রথা হিসেবে স্বীকার করলেও এটিকে হিন্দু আইনের মূল ধারণার পরিপন্থি বলে বিধবা বিবাহের আইনগত বৈধতা দেয়া হয় এবং বিবাহের পর ভূমিষ্ঠ সন্তানদের স্বীকৃতি দেয়া হয়।

২। The Hindu Disposition of Property Act, 1916 এর মাধ্যমে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে তার বরাবর সম্পত্তি দান করার আইনগত বৈধতা দেয়া হয়।

৩। The Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act, 1928 এর মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার যে প্রচলিত নিয়ম ছিল তা রদ করা হয়। তবে বাংলাদেশে শুধুমাত্র হিন্দু মিতাক্ষরা মতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য করা হয়।

৪। The Hindu Law of Inheritance (Amendment) Act, 1929-এ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুত্রের কন্যা, কন্যার কন্যা, বোন এবং বোনের পুত্রকে দাদার পর এবং চাচার আগে স্থান দেয়া হয়। তবে এটিও শুধুমাত্র মিতাক্ষরা মতাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য।

৫। The Hindu Women's Right to Property Act, 1937 আইনের মাধ্যমে বিধবাদের জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমান সুনির্দিষ্ট করা হয়।

৬। The Hindu Women's Rights to Property (Extension to Agricultural Land) Act, 1943 (Amendment Act)-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে কৃষিভূমিতে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৭। The Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act, 1946 দ্বারা বিশেষ ক্ষেত্রে নারীদের পৃথক বসবাস ও ভরণপোষণের অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হয়।

৮। The Hindu Marriage Disabilities Removal Act, 1946 দ্বারা একই কাস্ট বা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহের আইনগত বৈধতা দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, বর্ণিত আইনগুলো শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এসব রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা হিন্দু সনাতন ধর্মের প্রচলিত বিভিন্ন প্রথাতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হিন্দু নারীর অধিকারের প্রতি রাষ্ট্র সংবেদনশীল হয়েছে যার প্রতিফলন আইনগুলোর মধ্যে দেখা যায়। তাছাড়া কিছু প্রগতিশীল আইন বাংলাদেশের মিতাক্ষরা মতাবলম্বীদের মধ্যে প্রয়োগযোগ্য করা হয়েছে যা দায়ভাগ মতাবলম্বীদের সংস্কারের পক্ষে জোড়ালো যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

পারিবারিক বিষয় সংশ্লিষ্ট আরও কিছু রাষ্ট্রীয় আইন বৃটিশ ও বাংলাদেশ আমলে প্রণয়ন করা হয় যা হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও প্রযোজ্য। নিম্নে বর্ণিত এসব আইনের মাধ্যমে সনাতনী কিছু প্রথাকে মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে রহিত করা হয়েছে।

১। The Special Marriage Act, 1872 এর মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন ব্যাক্তিদের বিবাহ এবং হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মিশ্র বিবাহের আইনগত বৈধতা দেয়া হয়েছে।

২। The Succession Act, 1925 এর কিছু ধারায় হিন্দু উইল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্র বিবাহের ক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকার কিভাবে নির্ণয় করা হবে তা এই আইনে উল্লেখ করা আছে।

৩। The Child Marriage Restraint Act, 1929 হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইনের মাধ্যমে শিশু বিবাহ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য করা হয়।

৪। The Dowry Prohibition Act, 1980 এর মাধ্যমে সকল ধর্মের নারী পুরুষের বিবাহের সময় যৌতুক দেয়া নেয়া নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে।

বর্ণিত আইনগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য হল মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র যে প্রথাগত আইনের পরিবর্তন করেছে তা তুলে ধরা। এই ধারা বৃটিশ আমল থেকে চলে আসছে এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণও এর সুফল লাভ করছে। নিম্নে হিন্দু পারিবারিক আইনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে এর সংস্কারের যৌক্তিকতা এবং সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তুলে ধরা হল।

১. বিবাহ নিবন্ধন

আধুনিক বিশ্বে বিবাহের দালিলিক প্রমাণ রক্ষার্থে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন বা নিবন্ধন করার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের জন্য এখন পর্যন্ত কোন আইন প্রণয়ন করা হয়নি। এ সংক্রান্ত একটি বিল বর্তমানে জাতীয় সংসদে বিবেচনাধীন রয়েছে। তবে এর প্রয়োগ আবশ্যিক না করে স্বেচ্ছামূলক করা হয়েছে। এটি আবশ্যিক করা প্রয়োজন।

বিবাহ নিবন্ধন কোন ভাবেই হিন্দু বিবাহের ধর্মীয় চরিত্র খর্ব করে না। প্রথাগত যে নিয়মেই বিবাহ সম্পন্ন হোক না কেন, সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধনের নিয়ম বেঁধে দিলে এবং নিবন্ধন না করার কারণে কোন বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হবে না এই শর্ত সংযোজন করে দিলে তা বিবাহ সম্পর্কিত প্রচলিত হিন্দু আইনের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

নিবন্ধনের বিপক্ষের যুক্তি হচ্ছে হিন্দু বিবাহ ধর্ম পালনের অংশ এবং এটি কোন চুক্তি নয় বিধায় নিবন্ধন অপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু হলে আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ অশাস্ত্রীয় বিবাহের দিক ঝুঁকে পড়বে।

প্রকৃতপক্ষে নিবন্ধন দ্বারা শাস্ত্রমতে বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না। তাছাড়া রেজিষ্ট্রেশনের উপকারিতা বহুমুখী। নিবন্ধন থাকার কারণে আদালতে দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে বিবাহ প্রমাণ করা সহজ হবে। বিদেশ যাত্রা এবং বহুবিবাহ নিরোধের ক্ষেত্রে বিবাহ নিবন্ধনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নিবন্ধন বা বিবাহের দালিলিক প্রমাণ না থাকায় হিন্দু পুরুষরা বিভিন্ন স্থানে কাজ করতে গিয়ে একাধিক বিবাহ করছে এবং বিবাহ অস্বীকারও করছে। তাছাড়া একই দেশে মুসলিম ও খ্রিষ্টান আইনের অধীনে বিবাহ নিবন্ধনের ব্যবস্থা থাকলেও হিন্দু পুরুষ ও মহিলাগণ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন যা হিন্দু জনগোষ্ঠির মধ্যে অসন্তোষ তৈরী করছে। এমনকি হিন্দু আইনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কার বিমুখ কতক হিন্দু সংগঠনের প্রতিনিধিগণও নিবন্ধনের পক্ষে সরকারের দায়িত্বশীল প্রতিনিধির কাছে আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়েছেন। এমতাবস্থায় হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের জন্য আইন করা যেতে পারে।

জনমত জরীপ ঃ আইন কমিশনের প্রশ্নমালা

টেবিল ১ ঃ হিন্দু বিবাহের নিবন্ধন প্রয়োজন আছে কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৯১%	৮.৬%	০.৪%

সুপারিশঃ বিবাহ সম্পন্ন হবার ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অবশ্যই বিবাহ নিবন্ধন করতে হবে এবং বিবাহ নিবন্ধন না করলে জরিমানা ও কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করা হবে এরূপ বিধান রাখা যেতে পারে। পাশাপাশি বিবাহ নিবন্ধন না করলে কোন বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য করা হবে না এ শর্ত সংযুক্ত করা যেতে পারে।

প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসাবে প্রত্যেক উপজেলায় হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের জন্য রেজিষ্ট্রার নিয়োগ করা যেতে পারে।

২. বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুণর্বিবাহ

বাংলাদেশে প্রচলিত সনাতনী হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমোদন নেই। কারণ প্রথাগত আইনে হিন্দু বিবাহকে চুক্তি হিসাবে দেখা হয় না। বরং সকল ধর্মীয় ও জাগতিক কার্যসাধনের জন্য স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অবিচ্ছেদ্য বলে ধরা হয়। একান্তই স্বামীর সাথে বসবাসের উপায় না থাকলে বিবাহিত নারীর পৃথক বসবাস ও ভরণপোষনের জন্য আইন আছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদের সমর্থন পাওয়া যায়। ঋষি নারোদ ও ঋষি পরাশর বিশেষ পরিস্থিতিতে পুণর্বিবাহের পক্ষে মত দেন, যেমন- স্বামী মারা গেলে, নিখোঁজ থাকলে, অক্ষম হলে, সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলে অথবা ধর্মান্তরিত হলে পুণর্বিবাহ করা যাবে। যদিও স্পষ্ট ভাবে তারা বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলেননি তথাপি স্বামীর মৃত্যু ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ না করে পুণবির্বাহের সুযোগ সামাজিক ভাবেই ছিল না এবং তা বোধগম্য কারণে গ্রহণযোগ্যও নয়। তাছাড়া নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রচলন ছিল বলে প্রমান পাওয়া যায়।

যে ভালবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আজীবন স্বামী স্ত্রীর একত্রে বসবাসের কথা বলা হয় বাস্তবে এমন পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে একত্রিত থাকা কেবল মাত্র পরস্পরের মধ্যে তিক্ততাই বৃদ্ধি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে যে ক্ষেত্রে স্ত্রী নির্যাতনের শিকার হয়ে সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয় সে ক্ষেত্রে পৃথক বসবাসের জন্য আইনী অধিকার আদায়ের পথ তার জন্যে সহজ নয়। আবার এ অধিকার লাভ করলেও একাকি বসবাসের জন্য তার সামাজিক নিরাপত্তা পাবার সম্ভাবনা কম। সম্পত্তির অধিকার না থাকায় পিতৃ গৃহে বা ভাতৃ গৃহে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর অবস্থান করা কঠিন হয়ে যায়।

তাছাড়া স্বামী যখন এক স্ত্রীকে বিতাড়িত করে দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে সংসার ধর্ম পালন করতে থাকে তখন প্রথম স্ত্রী স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে নিরাপত্তাহীন জীবন যাপন করতে থাকবে এটি সুস্পষ্ট মানবাধিকারের লংঘণ। স্বামীর অক্ষমতা জনিত যৌক্তিক কারণেও হিন্দু স্ত্রীদের বিবাহ বিচ্ছেদের কোন সুযোগ নেই। আইনজীবী ইলা চন্দ্র তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন "আমার কাছে অনেক হিন্দু মেয়ে আসে, যাদের পক্ষে সংসার করা একবারেই সম্ভব নয়। তাদের কারো বক্তব্য হলো স্বামী দীর্ঘদিন ধরে যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন করছে, কারো সমস্যা স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম বা ইমপোটেন্ট"। একইভাবে বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন স্বামী যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায় সে ক্ষেত্রেও আইন না থাকার কারণে সে সফল হয় না।

বিবাহ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি হচ্ছে মুসলিম সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রচলন থাকায় নারীরা নিরাপত্তাহীন জীবন বেছে নিচ্ছে। বিচ্ছেদের শিকার নারীরা পেশা হিসেবে যৌনকর্ম বা অপরাধ জগতে সংযুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে তাদের শিশুরা পরিত্যক্ত হয়ে অপরাধজগতে প্রবেশ করছে। উল্লিখিত তথ্যটি গবেষণা নির্ভর নয়। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে শতকরা কতভাগ নারী বা শিশু অপরাধ জগতে প্রবেশ করছে তার কোন পরিসংখ্যান বা প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন হলে হিন্দু পরিবারে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে যাবে এই যুক্তির অসারতা হল স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সন্তান সন্ততিসহ একত্রে বসবাস করবে এই ইচ্ছে থেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ কারও কাংখিত নয় যদি না ব্যতিক্রমী কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বরং এ সংক্রান্ত কোন আইনের অবর্তমানে অনেকে এফিডেভিটের মত আইনগত ভিত্তিহীন উপায় বেছে নিচ্ছে।

বস্তুতঃ হিন্দু সমাজে বিচ্ছেদ না থাকায় কিছু হিন্দু নারী যে মানবেতর অবস্থায় জীবন যাপন করছে এ প্রসঙ্গে একাধিক গবেষণা হয়েছে এবং বিভিন্ন কেস স্টাডিতে বিষয়টি উঠে এসেছে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের এবং পুণর্বিবাহের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

জনমত জরীপ ঃ আইন কমিশনের প্রশ্নমালা

টেবিল ২ ঃ হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুণবির্বাহের সুযোগ থাকতে পারে কি?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৮০%	১৫%	০.৫%

সুপারিশঃ যে সমস্ত কারণে হিন্দু নারীর পৃথক বসবাসকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তার অধিকাংশ কারণই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য যুক্তিসংগত কারণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সুনির্দিষ্ট কারণে আদালতের অনুমোদন সাপেক্ষে এই বিচ্ছেদ কার্যকর করা যেতে পারে। বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হওয়ার পর উভয় পক্ষ পুর্নবিবাহ করতে পারবে।

৩. বহুবিবাহ

প্রচলিত হিন্দু আইনে বহুবিবাহ অনুমোদিত। অর্থাৎ বহুবিবাহ ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে অবৈধ নয় এবং রাষ্ট্রীয় আইনেও শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ নয়। কিন্ত প্রাচীন আমলে বৈদিক যুগে এক বিবাহই সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম ছিল। কারণ তখন নারীরা খুবই সম্মানজনক এবং উঁচু অবস্থানে ছিলেন। পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার ভোগে নারী-পুরুষের মধ্যে বড় কোন ব্যবধান ছিল না। স্ত্রীকে যথার্থই সহধর্মিণী বলা হতো।

বাস্তবেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বহুবিবাহের ঘটনা কমই ঘটে। সুতরাং সঙ্গত কারণ ব্যতীত বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হলে তা বর্তমান সমাজের প্রচলিত নিয়মকেই সুদৃঢ় করবে। অন্যদিকে বিনাকারণে দ্বিতীয় বিবাহ শাস্তিযোগ্য করা হলে এর প্রবণতা কমবে।

জনমত জরীপ ঃ আইন কমিশনের প্রশ্নমালা

টেবিল-৩ ঃ হিন্দু আইনে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা যেতে পারে কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৮২%	১৫%	০.৩%

সুপারিশঃ আইনে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতিত এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ না করে বহু বিবাহ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৪. অসবর্ণ বিবাহ

প্রথাগত আইন অনুযায়ী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ যা অসবর্ণ বিবাহ নামে পরিচিত তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রচলিত The Hindu Marriage Disablities Removal Act, 1946 এর মাধ্যমে অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা দেয়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আইনে একই গোত্রের মধ্যে এবং একই বর্ণের অধীনে বিভিন্ন উপবর্ণের মধ্যে বিবাহের সিদ্ধতা দেয়া হয় যা শাস্ত্র মতে নিষিদ্ধ ছিল।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে গেলে বৈদিক আমলে হিন্দু সমাজ বিভিন্ন শ্রেণী বা বর্ণে বিভক্ত ছিল না। বর্ণ প্রথা প্রচলিত হয় আরও পরে যখন নির্দিষ্ট পেশাজীবী কেবলমাত্র সেই পেশাতেই নিযুক্ত থাকত এবং ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ করে ভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে যোগাযোগ বা সম্পর্ক সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

ভিন্ন বর্ণ-এর মধ্যে বিবাহ এখন অনস্বীকার্য বাস্তবতা। পেশাগত দিক থেকে বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ এখন বংশপরম্পায় অনুসৃত পেশা বা ধর্মীয় অনুমোদন দ্বারা নির্ধারিত পেশা গ্রহণ করছে না। বরং আর্থিক সচ্ছলতার ভিত্তিতে পেশা নির্ধারিত হচ্ছে। সে অনুযায়ী আবার তাদের সন্তানগণ লেখাপড়া ও পেশা বেছে নিচ্ছে। বিবাহের ক্ষেত্রেও পেশার চেয়ে আর্থ সামাজিক দিক প্রাধান্য পাচ্ছে। একমাত্র ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ ছাড়া বর্ণ নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

South Asian Instiute of Advanced Legal and Human Rights Studies (SAILS) সেইলস-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী রানাদাস গুপ্ত বলেন, এক সময় আর্থিক দিক বিবেচনায় গোত্র নির্ধারিত হত। কিন্তু বর্তমানে নিম্ন গোত্র থেকেও অনেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় এবং সমাজে উচ্চ পদ ধারণ করে। সুতরাং ভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহে প্রাথমিক আপত্তি থাকলেও কালক্রমে এটা হিন্দু সম্প্রদায় মেনে নিচ্ছে।

অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে ১৮৭২ সনের Special Marriage Act এর অধীনে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে অসবর্ণ বিবাহ করছে। তবে সে ক্ষেত্রে এইরূপ বিবাহিত দম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণ The Succession Act, 1925 এর বিধান অনুযায়ী সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে অর্থাৎ প্রচলিত হিন্দু আইনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মাবলী তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

অনেকে আবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এফিডেভিট এর মাধ্যমে (যা কোর্ট ম্যারেজ নামে প্রচলিত) অসবর্ণ বিবাহ সম্পন্ন করতে আগ্রহী হয়। তাছাড়া অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ করার ভেতর দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ফলে ধীরে ধীরে সামাজিক আচরণে বর্ণবৈষম্যমূলক অমানবিকতা দূরীভূত হয়ে বিভেদহীন ঐক্যবদ্ধ সমাজ সংগঠন সম্ভব হয়ে উঠবে। এমতাবস্থায় বৈদিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্তমান বাস্তবতাকে সামনে রেখে ভিন্ন বর্ণ-এর মধ্যে বিবাহের বৈধতা দিয়ে আইন করা যেতে পারে।

জনমত জরীপ ঃ আইন কমিশনের প্রশ্নমালা

টেবিল ৪ ঃ ভিন্ন গোত্রের মধ্যে হিন্দু বিবাহ হতে পারে কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৭৯%	১২%	৯%

সুপারিশঃ ভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহের বৈধতা দিয়ে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৫. দত্তক

প্রচলিত হিন্দু আইনে কেবলমাত্র হিন্দু পুরুষ পুত্র সন্তান দত্তক নিতে পারে। স্ত্রীরা স্বামীর সম্মতিতে দত্তক নিতে পারে। মৃত পিতার সৎকার এবং শেষ কৃত্য পালনে পুত্রের ভূমিকা প্রধান বিধায় দত্তকের ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান নেয়ার প্রথার উৎপত্তি হয়েছে।

যৌক্তিক দিক দেখতে গেলে দত্তক নেয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সমান অধিকার প্রাপ্তির দাবীদার। কেননা নিঃসন্তান পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন সন্তান লাভের চিরন্তণ আকাংখা দত্তকের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। অবিবাহিত বা বিধবা নারীদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। কন্যা শিশু বা পুত্র শিশুর ভেদাভেদও যৌক্তিক নয়। অসহায় শিশু সে পুত্র হোক বা কন্যাই হোক দত্তক পিতা মাতার সুবাদে তারা নিরাপদ ও স্বাভাবিক জীবন পেতে পারে। তাছাড়া কন্যা সন্তানহীন অনেক পরিবারই কন্যা শিশু দত্তক নিতে আগ্রহী হয়।

পরিবারে কোন শিশুকে দত্তক নিতে গেলে শুধুমাত্র স্ত্রীদের ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতির দরকার হয়। এর চেয়ে অনেক যৌক্তিক যদি স্বামী স্ত্রী উভয়কে উভয়ের সম্মতি নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। কারণ

নতুন শিশুটি দত্তক বাবা মা উভয়ের পরিচর্যায় বড় হবে এবং উভয়ে শিশুটিকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে এটিই কাম্য।

জনমত জরীপ ঃ আইন কমিশনের প্রশ্নমালা

টেবিল ৫ ঃ কন্যা শিশুকে দত্তক নেয়া যেতে পারে কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৮৯%	৯%	০.২%

টেবিল ৬ ঃ স্বামীর ন্যায় স্ত্রীদের দত্তক নেয়ার অধিকার থাকা উচিত কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৮৬%	১১%	০.৩%

টেবিল ৭ ঃ অবিবাহিত মহিলারা দত্তক নিতে পারবে কিনা

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৮৩%	৯%	৮%

সুপারিশঃ স্বামী, স্ত্রী, অবিবাহিত পুরুষ বা মহিলা এবং বিধবা নারীদের দত্তক নেয়ার নিঃশর্ত অধিকার দিয়ে আইন করা যেতে পারে। তবে স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে পারস্পারিক সম্মতির বাধ্যবাধকতা সংযোজন করা যেতে পারে। দত্তকের ক্ষেত্রে মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর ভেদাভেদ দূরীভূত করে আইন করা যেতে পারে।

৬. সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

প্রথাগত হিন্দু আইনে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, কিছু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও অসতী নারীগণ সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সম্ভবত শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও নারীর শুদ্ধতা আধ্যাত্মিক কাজের জন্য এবং সম্পত্তি রক্ষার্থে অপরিহার্য মনে করা হত।

বাংলাদেশে The Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act, 1928 প্রচলিত আছে যার দ্বারা শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার কারণে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার নিয়ম রদ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে বসবাসকারী শুধুমাত্র মিতক্ষরা মতাবলম্বীদের জন্য এই আইন প্রযোজ্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ দায়ভাগ মতাবলম্বী বিধায় এই আইনের সুযোগ লাভ করতে পারেনা। তবে আইনটি বাংলাদেশে প্রযোজ্য হওয়ায় দায়ভাগ মতাবলম্বীদের জন্য আইন প্রণয়নের একটি ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। তাছাড়া সম্পত্তি রক্ষা ব্যক্তির শারীরিক বা মানসিক সুস্থতার চেয়ে সামাজিক,

রাজনৈতিক ও আইনগত অবস্থার উপরে বেশি নির্ভরশীল। বিশ্বে প্রতিবন্ধীদের সর্ব্বোচ অধিকার যেখানে নিশ্চিত করা হচেছ সেখানে তাদের প্রাপ্য অধিকার খর্ব করা কোন মতেই যৌক্তিক নয়।

টেবিল ৮ ঃ শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধীদের সম্পত্তির অধিকার থাকা যৌক্তিক কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৮৪.৫%	৯%	৬.৫%

সুপারিশঃ The Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act, 1928 আইনে অসতীত্বের কারণেও সম্পত্তি প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না বিষয়টি সংযোজন করাসহ আইনটি দায়ভাগ মতাবলম্বীদের জন্য প্রয়োগযোগ্য করে সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

৭. সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার

হিন্দু আইন সংস্কারের বিষয়ে সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরী হয়েছে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু দায়ভাগ আইন অনুযায়ী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৫ জন নারী উত্তরাধিকারী হচ্ছে- বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা, পিতার পিতার মাতা। নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে তারা সম্পত্তি ভোগের অধিকার পায়। এরূপ সম্পত্তির অধিকার widow's estate হিসেবে পরিচিত যদিও বিধবা ছাড়াও অন্যান্যরা এই অধিকার পেতে পারে। এই প্রকার অধিকারে তারা কেবলমাত্র জীবনসত্বে সম্পত্তি ভোগের অধিকার পায় অর্থাৎ জীবন অবসানের সাথে সাথে এই সম্পত্তি পূর্ব-মৃত ব্যক্তির পুরুষ উত্তরাধিকারীর নিকট চলে যায়। সীমিত কিছু ক্ষেত্র ছাড়া (legal necessity) এই সম্পত্তি হস্তান্তর করার অধিকার বিধবা মহিলা উত্তরাধিকারীদের নেই।

এরূপ সীমিত অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল যাতে বিধবা তার মৃত স্বামীর আত্মার আধ্যাত্মিক কাজ ও মৃত স্বামীর 'দায়' পরিশোধ এবং অবিবাহিত কন্যার বিয়ের খরচ নির্বাহ করতে পারে। পরবর্তীতে The Hindu Women's Right to Property Act, 1937 প্রণয়নের মাধ্যমে বিধবাদের অংশ সুনির্দিষ্ট করা হয় (অর্থাৎ এক পুত্রের সমান অংশ), কিন্তু সাথে সাথে এটিও সুস্পষ্ট করা হয় যে এটি শুধুমাত্র সম্পত্তিতে জীবনস্বত্বের অধিকার হিসেবে গণ্য করা হবে।

হিন্দু কন্যা পুত্রের উপস্থিতিতে সম্পত্তির অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। যদি পুত্র না থাকে তবে অবিবাহিতা কন্যা এবং পুত্রবতী কন্যারা জীবনস্বত্বে সম্পত্তির অধিকার পায়। অন্যদিকে বন্ধ্যা, বিবাহিতা কন্যা বা বিধবা কন্যা এবং কন্যা জন্মদানকারী কন্যাগণ সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থ্যাৎ কণ্যার অধিকার নির্ভর করবে পুত্র থাকা বা না থাকার উপর।

প্রচলিত আইনে সম্পত্তিতে নারীর পূর্ণ অধিকার থাকবে কেবলমাত্র স্ত্রীধনের উপর। স্ত্রীধন হচ্ছে নারীর স্বোপার্জিত আয় বা সম্পদ, বিবাহের সময় পিতা কর্তৃক প্রদত্ত যৌতুক অথবা দান বা উপহার। নারীকে যে সমস্ত সম্পত্তি দান বা উপহার দেয়া হয় তা তাদের আত্বীয়স্বজনের কাছ থেকেই আসে। এই

সম্পত্তি নারী ইচ্ছামত হস্তান্তর করতে পারে এবং তার মৃত্যুর পর তার নিজস্ব উত্তরাধিকারীর উপর এই সম্পত্তির অধিকার বর্তায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই দানের বিষয়টি সম্পুর্ণভাবে দাতাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অর্থ্যৎ স্ত্রীধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন নিশ্চয়তা নেই।

হিন্দু ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বৈদিক আমলে নারীরা খুবই সম্মানজন ও উচুঁ অবস্থানে ছিলেন। এমনকি এই অবস্থানে পৌঁছাতে অন্যান্য সভ্যতা বা ধর্মের শত শত বছর লেগেছিল। কন্যাদের মধ্যেও বিশেষ ব্যবধান করা হত না। সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারসহ নারীরা দেবীর মতই মর্যাদা পেতেন।

বৈদিক পরবর্তী সময়ে নারীদের অধিকারে অবনতি ঘটে। মনু স্মৃতিতে নারীদের উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার পুরোপুরি লোপ পায়। তবে শুরুর দিকে স্মৃতিকারগণ এই অধিকার না দিলেও পরবর্তীতে ধর্মীয় কাজে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে ব্যয় করতে নারীরা অধিকারী হয়েছিল। প্রচলিত আইন অনুযায়ী বর্তমান আমল পর্যন্তও নারীরা কেবলমাত্র সীমিত স্বার্থে ও শর্তসাপেক্ষে সম্পত্তির মালিক হয়।

কিন্তু বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে এই অবস্থা কখনই কাম্য নয়। স্বাভাবিক উত্তরাধিকারহীনতা নারীকে প্রায়ই প্রান্তিক অবস্থায় নিয়ে যায়। স্বামী পরিত্যক্ত নির্যাতিত নারীদের মানবেতর জীবনযাপনের কথা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রে পিতা বা ভ্রাতার গৃহে তার পরাশ্রিত হয়ে থাকতে হয়। পিতার সংসারে কিংবা স্বামীর সংসারে কিংবা পুত্রের সংসারে যে আশ্রিতা হিসেবে বাস করে, সে তার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশে কোন সুযোগ পায় না; তাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়।

সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি হচ্ছে নানা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে মেয়েরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাদের অংশ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না বরং সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তা প্রভাবশালী বিত্তবান লোকের হাতে চলে যাবে। আবার অনেকে বলেন সম্পত্তির লোভে অন্য ধর্মের লোক হিন্দু নারীদের প্রলোভিত করে তাদেরকে সম্প্রদায় ত্যাগ করতে বাধ্য করবে যার ফলে হিন্দু সমাজ ও সম্পত্তি ধ্বংশের মুখোমুখি হবে।

অন্যদিকে বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের মতে এ ধরণের ঘটনা ব্যতিক্রমী এবং সংখ্যায় নগণ্য। তাছাড়া হিন্দু পুত্রদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটছে না তা নয়। এ ভঙ্গুর যুক্তির সাহায্যে কন্যাদের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যুক্তি অমানবিক। তিনি আরও বলেন নারীরা যাতে সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে তার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে হবে এবং তাদের অধিকার সচেতনতা বাড়াতে হবে। নারীরা অধিকার রক্ষায় সমর্থ নয় এই কারণে তাদের সম্পত্তি দেয়া যাবে না এটি সামাজিক আদর্শ হতে পারে না।

নারীদের ধর্মান্তরিত হবার আশংকার ক্ষেত্রে এটি বলা যায় যে, The Caste Disabilities Removal Act, 1850 যা প্রকান্তরে The Freedom of Religion Act নামে পরিচিত তা বাংলাদেশে প্রযোজ্য নয়। কেননা এই আইনটি The Bangladesh Laws (revision and declaration) Act, 1973 দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। এই আইনটি না থাকার কারণে কেউ ধর্মান্তরিত

হলে হিন্দু ধর্মের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী সে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং, সম্পত্তির লোভে অন্য ধর্মের লোক হিন্দু নারীদের ধর্মান্তরিত করতে প্রলোভিত করবে এ আশংকা ভিত্তিহীন।

জনমত জরীপ ঃ আইন কমিশনের প্রশ্নমালা

টেবিল ৯ ঃ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীরা সম্পত্তির অধিকার পেতে পারে কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৮৬%	১০%	৪%

টেবিল ১০ঃ জীবন স্বত্বের পরিবর্তে নারীগণ সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার পেতে পারে কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৮২%	১১%	৭%

সুপারিশঃ উত্তরাধিকার সূত্রে নারী সম্পত্তির অধিকারী হবে। জীবনস্বত্বের পরিবর্তে সম্পত্তিতে নারীর পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৮. ভরণ পোষণ ও সন্তানের অভিভাবকত্ব

প্রচলিত হিন্দু আইন অনুযায়ী প্রত্যেক হিন্দু পুরুষ তার স্ত্রী, অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র, অবিবাহিত কন্যা এবং বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভরণপোষণ করতে আইনত বাধ্য। কিন্তু সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার দেয়ার সাথে সাথে নারী কর্তৃক ভরণপোষণের বিষয়টি এসে যায়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব যেমন নেয়া প্রয়োজন তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে অর্থাৎ স্বামীর অবর্তমানে বা অর্থ উপার্জনে অক্ষমতাজনিত কারণে সচ্ছল বা কর্মজীবী মহিলাদের বৃদ্ধ পিতামাতা বা সন্তানদের ভরণপোষণ করার বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার।

অভিভাকত্বের ক্ষেত্রে প্রচলিত হিন্দু আইনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে ক্রমানুসারে নাবালকের অভিভাবক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছেঃ

১। স্বাভাবিক অভিভাবক হিসাবে পিতা

২। পিতার অবর্তমানে পিতা কর্তৃক উইল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক

৩। উইল দ্বারা কোন অভিভাবক নিযুক্ত না হলে মাতা

৪। পিতা মাতা বা নিযুক্ত অভিভাবকের অবর্তমানে আদালত কর্তৃক নিযুক্তি অভিভাবক। এ ক্ষেত্রে আদালত পিতৃপক্ষের নিকটতম পুরুষ আত্মীয়কে প্রাধান্য দিবে এবং উক্তরূপ পুরুষ আত্মীয়ের অবর্তমানে মাতৃপক্ষের নিকটতম পুরুষ আত্মীয়কে প্রাধান্য দিবে। তবে পিতা কোন কারণে

অভিভাবক নিযুক্তির অনুপোযুক্ত গণ্য হলে বর্তমানে আদালত অভিভাবক নিযুক্তির ক্ষেত্রে সন্তানের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আদেশ প্রদান করছেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সন্তানের অভিভাবকত্ব নির্ণয়ের সময় সন্তানের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সুস্পষ্ট আইন হওয়া উচিত এবং অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার সমান অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে ভারতে হিন্দু আইনের সংস্কার করে মাতা থাকা অবস্থায় পিতার উইল দ্বারা অভিভাবক নিযুক্তির ক্ষমতাকে বাতিল করা হয়েছে।

জনমত জরীপ ঃ আইন কমিশনের প্রশ্নমালা

টেবিল ১১ঃ হিন্দু আইনে অভিভাকত্বের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার সমান অধিকার থাকা উচিত কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৯৬%	৩%	১%

জনমত জরীপ ঃ আইন কমিশনের প্রশ্নমালা

টেবিল ১২ ঃ আর্থিকভাবে সচ্ছল মহিলাদের তার সন্তানদের দায়িত্ব নেয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকার দরকার আছে কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৭১.৬%	১৬%	১১.৪%

জনমত জরীপ ঃ আইন কমিশনের প্রশ্নমালা

টেবিল ১৩ ঃ সন্তানের স্বার্থ বিবেচনায় অভিভাকত্ব নির্ণয় করার আইন করা যেতে পারে কিনা?

হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
৮৬%	৮.২%	৬.৮%

সুপারিশঃ কোন দুর্ঘটনা বা বার্ধক্যজনিত বা যুক্তিসঙ্গত কারণে স্বামী অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি সচ্ছল বা উপার্জনক্ষম হয় তবে স্বামীর ভরণপোষণ করতে বাধ্য থাকবে। একই ভাবে সন্তান ও বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর অবর্তমানে বা যুক্তিসঙ্গত কারণে অর্থ উপার্জনে ব্যর্থ হলে সচ্ছল ও উপার্জনক্ষম স্ত্রীকে নিতে হবে। ভরণপোষণের পরিমাণ কি হবে এবং এই পরিমাণ নির্ধারণে কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করতে হবে এ সংক্রান্ত পৃথক বিধান থাকা উচিত।

৯. হিন্দু আইন সংস্কারের প্রতিবন্ধকতা

ভারত বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অন্যান্য অনেক সমস্যার কারণে হিন্দু আইন সংস্কারের বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এরপর শত্রু সম্পত্তি আইন, ১৯৬৫ যা পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি আইন,১৯৭৪ হিসেবে পরিচিতি পায় তা প্রণয়ন করা হয় যা হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। ১৯৭৫ ও ১৯৮৮ সনে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র খর্ব করলে তাদের অবস্থা আরও নাজুক হয়ে উঠে।

২০০০ সনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন আইন প্রণয়ন এবং ২০১১ সনে তা সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিলেও এখনও হিন্দু জনগোষ্ঠির মধ্যে এই আশংকা রয়ে গেছে যে তালিকা তৈরীর মাধ্যমে হিন্দু সম্পত্তি অর্পিত হিসেবে নতুন করে তালিকাভুক্ত হবার সুযোগ তৈরী হতে পারে, যদিও সংশোধিত আইনটি অনেকটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। সংবিধান সংশোধন করা হলেও এখনও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকা নিয়েও হিন্দু জনগোষ্ঠির কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছেন এই বলে যে হিন্দু নারীগণ এই সংস্কার চান না এবং এটি এনজিওদের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত। কেউ কেউ মনে করেন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পারিবারিক আইনের সংস্কার সাধন করা ঠিক না।

প্রথমেই বলা যায় যারা বিরোধিতা করছেন তারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু তাদের বিভিন্ন ফোরামে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ বেশি। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ সংস্কারের পক্ষে থাকলেও (আইন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের গবেষণা, বিভিন্ন বেসকারী সংস্থার গবেষণা, বিভিন্ন সেমিনার, এফ জি ডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য) তারা তাদের মতামতকে জোড়ালো ভাবে তুলে ধরতে পারছেন না। বিশেষ করে নির্যাতিত বা সহায় সম্বলহীন নারীরা তাদের বক্তব্য জনপ্রতিনিধিগণের নিকট তুলে ধরতে প্রায়ই সক্ষম হন না।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পন আইন সংক্রান্ত যে আশংকার কথা বলা হয়েছে এ সম্বন্ধে এখনই মন্তব্য করা যাবে না। কেননা এই আইনে তালিকা থেকে অবমুক্তির সুযোগ রয়েছে যা প্রকৃত মালিকগণ গ্রহণ করতে পারবেন। শতকরা কতভাগ হিন্দু এই আইনের সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা কেন বঞ্চিত হয়েছে এই তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে আইনটি কতখানি কার্যকর হয়েছে তা নিরূপন করা সম্ভব হতে পারে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা না দেয়া পর্যন্ত পারিবারিক আইন সংশোধন সম্ভব নয় এই যুক্তির ভিত্তিও দুর্বল। কথিত নিরাপত্তা না দেয়া পর্যন্ত পারিবারিক আইনের কোন বিধান দ্বারা যদি মানবাধিকার লংঘিত হয় তবে তা চলতেই থাকবে এটি যুক্তিসংগত কথা নয়। বরং বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় নিতে হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে হিন্দু আইন অপরিবর্তনশীল এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হিন্দু আইনের উৎস ও ক্রমাবিকাশের অধ্যয়নে আমরা দেখেছি কিভাবে কিছু হিন্দু আইন যুগের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারাও এর সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। বৈদিক যুগের দৃষ্টিকোন থেকে হিন্দু আইনের মূল ধারা তুলে ধরা হয়েছে যা বাস্তবিকই প্রগতিশীল ও আধুনিক। সুতরাং হিন্দু

আইনের সংস্কারের বিরূদ্ধ যুক্তি ভিত্তিগতভাবে দুর্বল। এ প্রসঙ্গে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সংস্কার কার্যক্রম পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

১০. পার্শ্ববর্তী দেশের সংস্কার

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে হিন্দু আইনের ব্যাপক সংস্কার ঘটেছে। প্রশ্ন হতে পারে পার্শ্ববর্তী দেশের উদহারণ নেয়ার যৌক্তিকতা আছে কি? বৃটিশ আমলে বাংলাদেশ ও ভারত একই আইনের আওতাভূক্ত ছিল। আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অনেক কিছুতেই দু'টি রাষ্ট্রের মিল আছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ভারত হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। প্রাচীন আমলের প্রথাগত আইন এই অঞ্চলেও প্রয়োগ করা হত। ১৯৪৭ সালের পর ভারতে হিন্দু আইনের যে ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয় তার আলোকে সাধারণ জনগণের মধ্য থেকেই এ দেশের প্রথাগত আইন সংস্কারের দাবী উঠেছে । এ কারণে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের হিন্দু আইনের বিকাশের পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

ভারতে হিন্দু আইনের পরিপূর্ণ সংস্কার আসে ভারত স্বাধীনের পর। ১৯৫১ সনে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হবার পর হিন্দু আইনের সংস্কার নিয়ে হিন্দু কোড বিল ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়। নতুন আইনের দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদের প্রগতিশীল নীতিসমূহের সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন আদালতের পরস্পর বিরোধী নিষেধাজ্ঞাদের মধ্যে অবস্থিত পার্থক্য দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে ভারতে নিম্নোক্ত ৪টি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ হয়ঃ

1. The Hindu Marriage Act, 1955;
2. The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956;
3. The Hindu Succession Act, 1956;
4. The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956.

এই আইনগুলো দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনগুলো আনা হয় তা নিম্নরূপঃ

১। ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের আইনগত বৈধতা দেয়া হয়।

২। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় এবং একে শাস্তিযোগ্য করা হয়।

৩। বিবাহ বিচ্ছেদের এবং পুণর্বিবাহের জন্য বিধি প্রণয়ন করা হয়।

৪। বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের বিধান রাখা হয়।

৫। সন্তানের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে আদালতকে সন্তানের custody নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হয়।

৬। মিতাক্ষরা বা দায়ভাগ যে মতাবলম্বীই হোক না কেন সকলের জন্য uniform উত্তরাধীকার আইন প্রণয়ন করা হয়।

৭। পুরুষ ও নারী উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে সমান অংশ লাভের অধিকারী হয় এবং সম্পত্তিতে নারীরা পূর্ণ অধিকার লাভ করে।

৮। দত্তকের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বা পুত্র শিশু-কন্যা শিশুর পার্থক্য দূর করা হয়।

৯। সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধিতা বা নারীর অসতীত্বের কারণে যে বাধা ছিল তা রদ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে শুধু হিন্দু অধ্যুষিত একমাত্র দেশ হচ্ছে নেপাল। সেখানেও অনেকক্ষেত্রে ভারতের অনুরূপ হিন্দু পারিবারিক আইনের সংস্কার করা হয়েছে।

১১. সংক্ষিপ্ত সুপারিশ

১। হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হবার ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিবাহ নিবন্ধন করতে হবে, অন্যথায় জরিমানা ও কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করা হবে।

২। আইনে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট কারণে স্বামী বা স্ত্রী কিংবা উভয়ের উদ্যোগে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করা যাবে এবং বিচ্ছেদের পর পুণরায় বিবাহের সুযোগ থাকবে।

৩। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বহুবিবাহ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।

৪। ভিন্ন বর্ণ বা গোত্র এবং উপবর্ণের পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিবাহের আইনগত বৈধতা থাকবে।

৫। স্বামী, স্ত্রী, অবিবাহিত পুরুষ বা মহিলা এবং বিধবা নারী বা বিপত্মীকদের দত্তক নেয়ার অধিকার থাকবে এবং দত্তক শিশুদের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে ভেদাভেদ থাকবে না।

৬। উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন, শারীরিক ও মানসিক রোগ ও অক্ষমতা এবং নারীর অসতীত্ব, বন্ধাত্য বিলোপ করতে হবে।

৭। উত্তাধিকার সূত্রে সম্পত্তিতে পুত্রের সাথে কন্যার পূর্ণ ও সমান অধিকার থাকতে হবে, এবং বিধবা পূর্ণস্বত্বে উত্তরাধিকারী হবেন।

৮। সম্পত্তিতে নারীর পূর্ণ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করার পর স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব যেমন নেয়া প্রয়োজন, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে অর্থাৎ স্বামীর অবর্তমানে বা অর্থ উপার্জনে অক্ষমতাজনিত কারণে সচ্ছল বা কর্মজীবী মহিলাদের বৃদ্ধ পিতামাতা বা সন্তানদের ভরণপোষণ করার বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার।

৯। নাবালক সন্তানদের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার সমান অধিকার থাকবে।

১২. উপসংহার

উপরের পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় হিন্দু পারিবারিক আইনের সংস্কার প্রস্তাব মূলত নারী অধিকার উন্নয়নে নিবেদিত। এটি নারী-পুরুষ সমঅধিকারের বিষয়ক যা যুগ যুগ ধরে যে কোন আইনী ব্যবস্থায় একটি নাজুক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। নারী পুরুষ সমানাধিকারের বিষয়টি আধুনিক মানবাধিকার আইনের একটি প্রধান লক্ষ্য। সে লক্ষ্য পূরণে প্রচলিত হিন্দু আইনের সংস্কারের জন্য আইন কমিশন জোরালো সুপারিশ রাখছে। উল্লিখিত সুপারিশগুলো একটি পুর্ণাঙ্গ আইন করে অথবা বিষয়ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন আইন করে কার্যকর করা যেতে পারে।

(অধ্যাপক এম. শাহ আলম)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
আইন কমিশন।